খুঁটি-দেবতা

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটার দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি-দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় লাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বস্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরানো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা দখলে আসিলেও চরাটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন। একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলুখড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন।এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারে কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবারভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী হাতে বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একখানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ি আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ—ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধূলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা। ছই-এর মধ্যে কে?... নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।
—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?
নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই...

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, দ্যাখো কাণ্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পূর্বদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা...।

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।
রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুন গয়না কিছু আছে। ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি

গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধান করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুরে যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপুর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছিল কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল— লোকো-কারখানায় যদি মুগুর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুণি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইসম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটী আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পুবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখনঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায়?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল।—বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি?...

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছু হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল।গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল—একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবার পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—দ্যাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবেনা, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ ঘরের পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে?তুমি উত্তর দিকটা থেকে দ্যাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ার আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না।

পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনোদিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুণা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরারা এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়। ...এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরার দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনার বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণ-ছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজখানি!....

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না— স্বামীকে নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর-অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে করজোড়েবার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমার করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে, তোমাকেই বলছি...

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর, চওড়াতে হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কন্টিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোন গাছপালা নাই, ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে।

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কতকি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে—সারা মাঠ চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদূষীর মত মনেপ্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।...

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থায় দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত; নানারকম ঔষধ, জড়ি, বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ভালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল।কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি

কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা—ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ওদিকে অসুস্থ তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙেরমিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘরখানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল। মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগাগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবীর মিস্ত্রি খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন।প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা...এগারোটা... বারোটা...রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন— ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই। চাঁদ ঢলিয়াপড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা।...রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?...উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন— আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম...ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?...রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল, তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন।

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি রাতে রাঘবের চোখে এতটুকু ঘুম আসিল না পলকের নিমিত্ত—রাঘব পাগলের মত হইলেন—যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম...

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রির দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল। রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়াকথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এরকম করে দ্যাখো দিকি?আর সকাল সকালে শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়?...পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা...এক ঘণ্টা...। এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন...বুকের মধ্যে গুড়গুড় করিতেছে কেন?...না, এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।...রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই—কাওরাপাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিকে ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?...না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?...যাহা হউক জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক্, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁটকী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন।একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়বিনয় করিতেছেন, হাতজোড় করিতেছেন—তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্। এখনও জন তিনেক বাকী!...রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।...এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র!... মিনিট পনেরো দেরী— তাহা হইলেই ঘুমাইবেন।

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট?...এ সব কি আবোলতাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়...

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?...ওটা কিসের শব্দ?... বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?...সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এতটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেনধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?...

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে।রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুন...

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।...ঘুমাই নাই, তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল।হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারায় মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোম্‌টা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে

আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু বলবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না?কিন্তু তার কাছে...

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা।বিশ্বাস করো আমার কথা....

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!...

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরক্রার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই।...

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তারা মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্ত অবস্থায় বাঁচিয়া রহিল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই! তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি!...

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তাহার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটকায় পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপবিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটিদেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।